Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 343–353
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা ছোটোগল্পের বিভিন্নতা

নাজমা ইয়াসমিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : najmah.yasmeen@gmail.com

Keyword
মুক্তিযুদ্ধ, আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি, উদ্বাস্তু ও শরণার্থী সমস্যা, সাধারণ মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা, নারী নির্যাতন

Abstract
ভাষা, ধর্ম ও রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে মুক্তিযুদ্ধের জন্ম হলেও বাঙালির আবেগ, আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে জড়িত ছিল। বাংলা ছোটোগল্পের সমৃদ্ধ জগতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ছোটোগল্পে যুদ্ধকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে সুগভীর অভিনিবেশে। যুদ্ধের নারকীয়তা, রাজাকার সহ বিভিন্ন সহযোগীদের স্বার্থান্বেষী উল্লাস, পৈশাচিক নারী-নির্যাতন, স্বদেশ হারানো মানুষের জীবন যন্ত্রণা, অস্তিত্বের সংকট, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনিশ্চিত আশা, যুদ্ধ পরবর্তী দেশ-জন্মের প্রাক্কালে স্বজন হারানো মানুষের হতাশা, নৈরাশ্য ও ক্ষোভ মুক্তিযুদ্ধ-আশ্রয়ী ছোটোগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে, বর্ণনা বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ ছোটোগল্পগুলি সত্তর দশকের রাজনৈতিক গল্পের আলোচনায় তথ্যনিষ্ঠ আকর বলে বিবেচিত হয়।

Discussion
বাঙালির মুক্তিকামী চেতনা, ভাষা ও ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত ও যুদ্ধকালীন বাস্তবতার সংবেদী রূপ বাংলা ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার ও সহযোগীদের নারকীয়তা, সাধারণ মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা, উদ্বাস্তু পরিবারের অস্তিত্ব সংকট, স্বাধীনতা-উত্তর দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শূন্যতা, ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তির স্বৈরাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশা-নৈরাশ্য এবং তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার ছবি বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের চলিষ্ণু ধারার গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সাহিত্য কাঁটাতারের সীমানায় আবদ্ধ থাকে না। দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। এই প্রবন্ধে তাই বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ছোটোগল্পে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধকালীন দেশের আভ্যন্তরীন নারকীয়তা ও রাজাকার সহ বিভিন্ন সহযোগীদের হত্যালীলার ছবি হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে দেখা গেছে। নামহীন এক পথচারী চেনা শহরের অচেনা, দমবন্ধ, থমথমে পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে শোনেন মিলিটারি বুট, গুলির শব্দ আর মিলিটারি জিপের ভেতরের নারীকণ্ঠের গোঙানি। দেখেন, সেনার হাতে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসাবাদের প্রহসন কিভাবে নৃশংসতায় পরিনত হয়। পথচারী নিজের পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে স্ত্রী-সন্তানের হাড়-কঙ্কাল কোদাল চালিয়ে খুঁড়ে বের করেন। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল নৃশংসতার ছবি কল্পনা নয়, গল্পকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপ। নয় মাসে বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত যাবতীয় অপরাধের জন্য যেমন দায়ী করা যায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনির শীর্ষ কর্মকর্তাদের, তেমনি দায়ী করতে হবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনির 'অক্সিলারী ফোর্স'-রাজাকার-আল বদর-আল শামস, বিভিন্ন পাকিস্তানি সিভিল ফোর্স সদস্য ও শান্তি বাহিনিকে। তাদের নৃশংস অত্যাচারের শিকার সাধারণ মানুষ। বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক গনহত্যার লক্ষ্যস্থল ছিল ১৫ থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ। বাকি নারী এবং শিশু ছিল সংখ্যায় প্রায় ছয় লক্ষ। এর মধ্যে যে সমস্ত মহিলা নিহত হয়েছেন তাদের অধিকাংশই মৃত্যপূর্ব যৌন নির্যাতনের শিকার হন। রুমেলের 'Death by Government'- বইয়ের তথ্য অনুযায়ী ধর্ষিতা বীরাঙ্গনার সংখ্যা চার লক্ষ বলা হলেও ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি পরিচালিত তদন্তে ধর্ষিতা বীরাঙ্গনার সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

> "ধর্ষণ ও আনুষঙ্গিক আঘাতের কারণে মৃত্যুর হিসাবটি আলাদাভাবে করায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, এই সাড়ে চার লক্ষের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা একইসঙ্গে ধর্ষিত ও নিহত। ধর্ষিতাদের এক বিরাটাংশ নিজেদের সম্মান ও সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছেন। অনেকে বিভিন্ন এনজিওর সহায়তায় পাশ্চাত্য বিশ্বে আশ্রয় নিয়েছেন।"[১]

শুধু হত্যা বা ধর্ষনেই এই নৃশংসতা শেষ হয়নি, এই শিকড় ছিল আরও গভীরে- পরিকল্পিত ধর্ষণকর্মের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা ৭১-এ বাংলার নানা স্থানে enforced pregnancy চাপিয়ে দেয়। পরিকল্পিতভাবে তারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, নির্বিচার হত্যা করে, গণধর্ষণ করে, এমন জীবনবিনাশী অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে জনগণ আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও ভিটেহারা হয়ে ভিনদেশে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মৃত্যুর পাশাপাশি জীবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে আকারে ক্ষুদ্র 'নবজাতক' গল্পে। চারপাশের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মাঝে মানুষ যখন প্রাণভয়ে পালাতে ব্যস্ত আর মাথার উপর দিয়ে বোমারু বিমান উড়ে যাচ্ছে তখন বোমার সুদূর শব্দ ছাপিয়ে এক আসন্নপ্রসবা মায়ের চিৎকার শোনা যায়। কাঁচা রক্তের মধ্যে উদোম শরীরে সেই নারীর নবজাতকের জন্ম যেন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র-জন্মের ইঙ্গিত দেয়। হতাশ, অবসাদগ্রস্ত পরিস্থিতিতে এক নতুন প্রাণের আগমনবার্তা আশার আলো বহন করে আনে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু একটি জড় পদার্থ বর্ষাতি হলেও তাতে মিশে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার শরীরের উষ্ণতা ও মনের দৃঢ়তা। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে রসায়নের প্রভাষক নুরুল হুদার যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মনস্তত্ত্ব নিয়েই গড়ে উঠেছে এই গল্পের দৃশ্যপট। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট ব্যবহারের পর নুরুলের নাগরিক জীবনের স্থিতিশীলতাকে ও পলায়নী মনোবৃত্তিকে ছাপিয়ে গল্পে এক ভিন্ন ভাবধারার প্রবাহমানতা সৃষ্টি হয়েছে। রেইনকোট আসলে একটি মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের জন্ম দেয়, যা মানুষকে সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। পাক-হানাদারদের নির্মম হত্যা লালসার ছবি সেলিনা হোসেনের 'ছায়াসূর্য' গল্পে পিতৃহারা ১৩ বছরের কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা যায়। দৃঢ়তা ও শপথকে অন্তরে পাথেয় করে এগিয়েছিল আলাউদ্দিন আল আজাদের 'রূপান্তর' গল্পের তরুণ যোদ্ধা জয়। দেশের টালমাটাল অবস্থায় জয় এবং আরও ১২ টি ছেলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ট্রেনিং নিতে মনস্থির করে। সঙ্গে নেয়-

> "মাত্র একটা সার্ট,একটা লুঙ্গি; পকেটে ছাপান্ন টাকা।"[২]

তারপর সড়ক পথ, নদীপথ, মিলিটারি ঘাঁটি এড়িয়ে শরণার্থী সঙ্গ পেরিয়ে তারা ট্রেনিংয়ের জন্য আসে গেরিলা ট্রেনিং সেন্টার অমপিনগর, যা দুর্গম ও বন্যপ্রাণীদের যাতায়াত করার আদর্শ স্থান। সেখানে তার ট্রেনিং-এর বিবরণ পাওয়া যায়-

> "ভোর পাঁচটায় শয্যাত্যাগ, সাড়ে পাঁচটা থেকে দুটো পিটি; আধঘন্টা চা-পুরি নাস্তা। সাড়ে ছ'টা থেকে বারোটা হাতিয়ার শিক্ষা। খোলাজোড়া এবং ফায়ার। গোসল, খাওয়া-দাওয়া বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত এবং আবার, আড়াইটা থেকে চারটা হাতিয়ার। হাতিয়ার সবরকম। থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এসেলার এলেমজি। এলেমজি টু-ইঞ্চ মার্টার। চাইনিজ রাইফেল, চাইনিজ এসেমজি। আইয়ে আর জিওথ্রি। থার্টিসিক্স হ্যান্ডগ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ।"[৩]

ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন করা ছাত্রের কর্তব্য হলেও দেশের কাজে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে এখন পুরোদস্তুর ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তার চারিদিকে অসহায় মানুষের চিৎকার, কোলাহল আর বিবস্ত্র নারীর ক্ষতবিক্ষত মুখ। একজন শহুরে, শিক্ষিত, সরকারি চাকুরিজীবীর পুত্র হওয়ার সুবাদে পূর্ব-পাকিস্তানের বাসিন্দা জয় আরামদায়ক জীবন বেছে নিতে পারত। কিন্তু দেশে যখন বিদ্রোহের, প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে, তখন বিবেকের ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারেনি। কঠোর তপস্যায় তার 'রূপান্তর' ঘটেছিল সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার পথে। পুল ভাঙার সফলতায় সে অনুভব করে কবিতার বিস্ফোরণ। গল্পে যেমন গল্পকারের সমাজমনস্কতার ছবি ফুটে উঠেছে, তেমনি চরিত্রগুলির মধ্য থেকেও উদ্ভাসিত হয়েছে গভীর জীবনবোধ। মুক্তিযোদ্ধা রূপান্তরের পথ যে মসৃণ ও সহজলভ্য নয়, তার বিস্তারিত পরিচয় গল্পে আছে। অন্যদিকে ভারত সরকার কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করত, কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত, তারও বাস্তবনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায়। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক বিষয়টি এসেছে জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পে। কথক মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ সংগ্রহের কাজে গিয়ে এক মুক্তিযোদ্ধার ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে যাওয়া লাল মলাটে বাঁধানো খাতার লেখ্য বিবরণে পান মানুষের কান্নার আওয়াজ, চারদিকে হাহাকার আর পাকসেনাদের জন্য আকণ্ঠ "ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা,"[৪] পাক হানাদার বাহিনির নৃশংসতার ছবি। তার সহ যোদ্ধাদের কথা, মৃত সঙ্গীদের কথা ভুলতে পারে না সে-

> "তারা কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিনমজুর। কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানী। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।" [৫]

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের ছবি আমরা আগেও নানা গল্পে পেয়েছি। ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধরত এক যোদ্ধার দিনযাপন, ভাবনা, আবেগ সব যেন ডায়েরির পাতায় পাতায় ডালপালা মেলেছে। এই দীর্ঘ বিবরণ হতভাগ্য স্বল্পায়ু জীবনের অপূর্ণ, অনাস্বাদিত স্বপ্ন। মুক্তিযোদ্ধারা যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ সেখানে সকলের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য অভিন্ন। মৃত্যু, অনিশ্চয়তা আর হতাশার মধ্যেও মুক্তিকামী মানুষ জীবনের প্রাচুর্য দেখতে পান। অশান্ত, দমবন্ধ আতঙ্কের এক পরিবেশে দাম্পত্যের সুকুমার সৌন্দর্য ও মাধুর্য কেমন করে নষ্ট হয়ে যায় তা দেখান হয়েছে আবদুল গফ্ফর চৌধুরীর 'কেয়া আমি ও মেজর জার্মান' গল্পে। টেলিফোনের যান্ত্রিক শব্দের প্রতি আচ্ছন্নতা ও আতঙ্ক অতিক্রম করে যে জীবনের দিকে দম্পতি মনোযোগী হতে চায়, সে জীবন ভয়ে, শিহরণে কম্পমান। দাম্পত্যের মধুর মুহূর্তে স্ত্রী কেয়া, স্বামীকে প্রশ্ন করে যদি নারী-লোভী সামরিক বাহিনি কেয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়, তখন স্বামী কী করবে? তিনবার একই প্রশ্নে স্বামী ছিল নিরুত্তর, নিস্তব্ধ। স্বামীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে প্রতিরোধ করাই উচিত ছিল, সে প্রতিরোধের ফলাফল যাই হোক না কেন। বাক শক্তির স্তব্ধতা কেয়ার মনে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। জীবনসঙ্গীকে মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রৌঢ় মেজর জার্মানের মত, যিনি ছিলেন লম্পট, কাপুরুষ, নৈতিকতা বিসর্জনকারী। এই গল্পে ঘটনার পরিবর্তে দেশীয় বিরূদ্ধ শক্তির সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির আঁতাত ও অস্ত্র সাহায্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনির নারী-মাংসের প্রতি লোভ এবং লালসা পূর্তির পরে সেই নারীকে হত্যার নির্মম চিত্র কোন নৈতিকতার ধার ধারে না। আবার দেশের পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক এটা দেখানোর জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর জোর

করে কিছু নির্দেশিকা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে দেশের বাইরে এই মেসেজ যায় যে দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করছেন। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ভয়াবহতা ও নিরপত্তাহীনতা কেমন করে ঘাটি গেঁড়ে বসে তা এই গল্পে শাব্দিক রূপ পেয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অপঘাত' গল্পে যুদ্ধ চলাকালীন মিলিটারি আতঙ্কিত, লাশের গন্ধে ভারি হয়ে ওঠা একটি গ্রামে সন্তানের শোকে মায়ের কান্নাকেও নিষিদ্ধ করতে হয়। তরুণ বুলু মুক্তিযুদ্ধে মারা যায়। এ মৃত্যকে 'অপঘাত' বলেই বিবেচনা করে তার পিতা। কিছুদিন পরে গ্রামের চেয়ারম্যান আনোয়ারের পুত্র শাজাহান রোগভোগে মারা গেল। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন চেয়ারম্যানের কান্না শুনে মৃতদেহ দ্রুত দাফনের নির্দেশ দিলেও জটিলতা সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ও হেনস্তার পর গ্রামের আলপথ দিয়ে তারা বাধ্য হয়ে গোরস্থানে পৌঁছায়। শাজাহানের মৃতদেহ কাঁধে বহন করতে করতে বুলুর কথা মনে পড়ে তার বাবার। মৃত বুলুর দেহ শেষবার দেখার বা দাফন করার সুযোগ সে পায়নি। তাই মনে মনে আশা হয়ত বর্ষার জলে বুলুর লাশ যমুনায় চলে গেছে। মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে মানুষের জীবনবোধ, যুদ্ধের ভয়াবহতা, সমাজের পারিপার্শ্বিক চালচিত্র নির্মাণে গল্পটি অনন্য। গল্পে দুটি মৃত্যুর প্রত্যক্ষতা এবং অসংখ্য পরোক্ষ মৃত্যুর খবরে ঝাঁঝরা হয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষ শব্দ করে, গলা ছেড়ে কাঁদতেও পারে না। পারে না পুত্রের শেষ যাত্রায় সঙ্গী হতে। গল্পের সিংহভাগ জুড়ে আছে মৃত্যুর কথার ফাঁকে ফাঁকে বুলুর আত্মত্যাগ ও মৃত্যুর মহিমা। শাজাহানের শবদেহ বহন করতে করতে নবপ্রাপ্ত আত্মচেতনার আলোকে বুলুর মৃত্যুর তাৎপর্য উপলব্ধি করে পিতা। স্বাধীনতা যুদ্ধে অগণিত শহীদের পিতার রক্তাক্ত হৃদয় ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয় যেন এক হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনাদের সঙ্গে সশস্ত্র অপারেশন চলাকালীন নিহত সঙ্গীদের লাশের মাঝে ক্ষতবিক্ষত আনোয়ারের ব্যক্তিগত অনুভব দিয়ে কায়েস আহমেদের 'আসন্ন' গল্পের প্রারম্ভ। যুদ্ধের এক টুকরো রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের কথা গল্পে বিধৃত হয়েছে। গল্পের সূচনায় শেয়ালের আক্রমণকে পাকসেনাদের ধূর্ত আগ্রাসনের সঙ্গে এবং গল্পের সমাপ্তিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুকে বাঘের পরাক্রমতার সঙ্গে তুলনা এক ভিন্ন ব্যঞ্জনাকে দ্যোতিত করে। রবিউল হুসেইনের 'মাটির মেডেল' গল্পে এক মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধচলাকালীন পরিস্থিতিতে ঘরে ফেরা, পথে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার মিলন মুহূর্তেই তছনছ হয়ে যায় সমস্ত সুখানুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা। হঠাৎ করে মিলিটারি ধরে নিয়ে যায় বন্ধুকে। হতাশায় ক্যাম্পের দিকে ফিরে দ্রুতগতিতে পা চালিয়ে যেতে যেতে সময়ের অসহায়তা ও অনিশ্চিত জীবনের প্রতি এক আত্মগত অনুভবে জারিত হয় তার মন। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের অনুসারী হয়ে সে দেখে জন্মভূমির মাটি যেন তার গলায় মেডেল হয়ে ঝুলছে। মাটির স্বাধীনতার জন্য তাদের মরণপণ লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে 'মাটির মেডেল'। বিপ্রদাশ বড়ুয়ার 'সাদা কফিন' গল্পটিতে যুদ্ধকালীন থমথমে প্রতিবেশ, চারিদিকে মানুষের নিঃসঙ্গতা, পারিপার্শ্বিক নিস্তব্ধতা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশিত। ঢাকা শহরের রাস্তায় ইঁট, ড্রাম, ওল্টানো গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে একদল মুক্তিবাহিনি। চারিদিকে সারি সারি ইমারতের জনশূন্যতা, বন্ধ রেস্তোরা, হাইকোর্ট ভবনের রহস্যময়তাকে অতিক্রম করলে শোনা যায় সৈন্যবাহিনির গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ ও বুটের আওয়াজ। স্বজন বান্ধবহীন অবস্থায়, কেবলমাত্র নিজেকে বাঁচানোর নির্নিমেষ আকাঙ্ক্ষায় কথক নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। তখনই তিনি দেখতে পান তার পরনের পোশাকে রক্ত লেগে আছে। নিজেকে যুদ্ধের উত্তাপ থেকে নিরাপদে রাখার প্রানান্ত প্রচেষ্টার পরেও যুদ্ধের ভয়াবহ প্রত্যক্ষতা তাকে গ্রাস করে ফেলে।

ছিন্নমূল মানুষেরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত- উদ্বাস্তু ও শরণার্থী। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক অসংখ্য গল্পের মধ্যে শরণার্থী সমস্যা ও ভিটেত্যাগের যন্ত্রণা রেখাপাত করেছে আহমদ বশীরের 'অন্য পটভূমি' গল্পে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা স্টেশন থেকে ছাড়া একটি ট্রেনের যাত্রী জাহিদ ও তার মেজ ভাই। মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছে তাদের বড় ভাইকে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশত্যাগ করে আসার পর প্রথমে তারা ছিল পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে, পরে আশ্রয় পায় দাদু ঠাকুমার কাছে। দেশের স্বাধীনতার খবর পেয়ে তারা বাংলাদেশ ফিরে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা, এই খবর জানার পর তাদের সহযাত্রীর মুখে শোনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বক্তব্য, যাতে কটাক্ষ ও অনুকম্পার সুর প্রকট। অবিভক্ত

ভারতবর্ষের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মহান বাঙালি 'আমাদের', 'তোমাদের' হয়ে গেছেন। ভাঙাচোরা স্মৃতি, প্রিয়জন হারানোর শোক আর প্রিয় ভূমিতে ফিরে আসার আনন্দ নিয়ে দুই ভাই যখন বাড়ির পথে পা বাড়ায় তখন শোনে চারিদিকে গুলির শব্দ, 'মুক্তিবাহিনী থানা কমান্ড' লেখা সাইনবোর্ড, মুজিবের প্রশস্তিতে গান বাজে রেডিওতে। অনুভব করে মুক্তিযুদ্ধের বিধ্বংসী আগুনে শুধু তাদের শৈশব নয়, পুড়েছে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীর জয় গোবিন্দ মিষ্টান্ন ভান্ডার। সব হারানোর যন্ত্রণার পরেও নিজেদের জঠরাগ্নি নিবৃত্তির তাগিদে 'ভাত রাঁধছে মা'। রাতে শুয়ে সর্বস্ব হারানোর পর খড়কুটো আশ্রয় করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে থাকা বাবা প্রশ্ন করেন –

> "ওরা কিছু দেবে বলে মনে হলো? ইন্ডিয়ার ঘরবাড়ি পেলে এখন বেশ হয়, কি বলিস?"[৬]

ভারতের বাসিন্দা আত্মীয়ের কাছ থেকে মেজদা ঠিক এই কথাটির বিপরীত কথা শুনে এসেছে-

> "শরণার্থী-টরণার্থী ওসব ঝুট কথা, এই বেল্লিকরা এসেছে আমাদের ঘরবাড়ির ভাগ নিতে।"[৭]

ফলে এই বিষয়ে নেতিবাচক উত্তর ছাড়া আর কিছু দেওয়ার থাকে না বাবাকে। পাকিস্তানি মিলিটারির আত্মসমর্পণের খবর পেয়ে দীর্ঘ নয় মাস পরে অসংখ্য শরণার্থী নিজেদের পরিবারের সঙ্গলাভের জন্যে উদগ্রীব হয়ে বাংলাদেশে ফিরতে থাকেন। প্রতিমুহূর্তে তৈরি হওয়া আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, অবজ্ঞা, অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন তাঁরা। ছিন্নমূল এই মানুষগুলি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে যে যন্ত্রণায় ছিলেন, দেশে ফিরে গিয়েও কোনো নিশ্চিত আশ্রয়ের নিরাপত্তার আশ্বাস তাঁরা পাননি। গল্পে মেজভাই পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয়ের কাছে জবর দখল করার অভিযোগ শোনে। আবার দেশে ফিরে বাবার মুখে ভারতের ভিটেমাটিতে বাস করার আকাঙ্ক্ষা শোনে। সাধারণ মানুষের স্থায়ী বাসিন্দা থেকে শরণার্থীতে পরিণত হওয়ার এই দুঃসহ যাত্রার সমাপ্তি নেই। দাদির অপত্য স্নেহশীল কথার অপর পিঠেই থাকে শরণার্থীদের প্রতি ঘৃণা জনিত মনোভাব। ট্রেনের সহযাত্রীদের অবজ্ঞা আর স্থূল রসিকতার যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে আসে তারা, সেখানেও কোন আশাভরসার ইমারত দাঁড়িয়ে থাকে না। বাবার আশায় জল ঢেলে সে নির্মম হয়-

> "ওসব ভুলে যাও বাবা, আমাদের ওরা কিচ্ছু দেবে না।"[৮]

হাসান আজিজুল হকের 'ঘরগেরস্তি' গল্পের মূল চরিত্র রামশরণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ধর্মান্ধ মানুষের অত্যাচারে ভিটেমাটি ও জন্মস্থান ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী দেশ ভারতে। পরে দেশের স্বাধীনতার খবরে বহু আশাভরসা স্বপ্ন নিয়ে নিজের ভিটেতে ফিরে আসে। কিন্তু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা পেলেও সাধারণ মানুষের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। অনাহারে, পথশ্রমে ছেলে-মেয়েরা এক এক করে মৃত্যুর মুখে পতিত। অবশিষ্ট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী ভানুমতীকে নিয়ে রামশরণ লঞ্চঘাটের পাশ দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে। রাজনৈতিক কারণে যে যুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তি তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশা পীড়িত হয়েছিল সাধারণ মানুষ। তাদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করা হয়। যুদ্ধশেষে কিন্তু তাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা দেয় না সরকার। 'ঘরগেরস্থির' এই আকাঙ্ক্ষা, এই অনুসন্ধান থেকে জীবনভর জারি থাকে। আশ্রয়হীন মানুষের বাস্তুভিটায় প্রত্যাবর্তন প্রকৃতপক্ষে এক রক্তাক্ত অতীত থেকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে যাত্রা। ১৯৪৭-এর মত সম্পত্তি এক্সচেঞ্জও এক্ষেত্রে হয়নি। পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করার বর্বরতায় এক কোটিরও বেশি বাঙালিকে ঘরছাড়া করে যে 'forced migration'এ বাধ্য করে, এ যুদ্ধোপরাধ হলেও এই অপরাধের কোনো শাস্তি পাকিস্তানি সেনাবাহিনি ও রাজাকাররা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পায়নি। বশীর আল হেলাল রচিত 'শবের নিচে সোনা' গল্পেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়ে আসা একটি সংখ্যালঘু পরিবারের জীবন সংগ্রামের ছবি আছে।

যুদ্ধকেন্দ্রিক গল্পগুলির অন্যতম বিষয় যেমন পাকহানাদারদের নৃশংসতা, তেমনি তার অনুষঙ্গ হিসেবে গল্পে স্থান পেয়েছে সহযোগী রাজাকার ও আলবদর আলশামসদের সমাজপতি হওয়ার তীব্র বাসনা, কৌশল, ঘাতকদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ। সেলিনা হোসেনের 'ভিটেমাটি' গল্পে রাজাকারদের সমাজে প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও প্রাক্তন

মুক্তিযোদ্ধাদের অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। পুত্রের জন্ম দিয়েই মারা যায় হাফিজ মিয়াঁর স্ত্রী। খুব কাছ থেকে বন্ধুর বাবার হত্যা দেখে মুক্তিযুদ্ধে চলে যায় বংশের একমাত্র 'চেরাগ' লতীফ। মৃত মুক্তিযোদ্ধা লতীফের সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় শিবপুর ক্যাম্পের ইনচার্জের জবানিতে। পুত্রের একদা 'বন্ধু' জগলু যুদ্ধের সময় সঙ্গ দিয়েছিল রাজাকারদের, তার পুরস্কার স্বরূপ মাসান্তে পাওয়া বেতন দিয়েই সংসার চালিয়ে সে বর্তমানে চাল-ডালের বিরাট আড়তদার। পুত্র হন্তারকের প্রতিপত্তি দেখে হাফিজ এখন আবার যুদ্ধ চায়। জীবন যুদ্ধে হেরে যেতে যেতেও হাফিজ মিয়াঁ তার পুত্রের বন্ধু বাবলুর চোখে দেখে অপমান আর প্রতিশোধের আগুন। সেই আগুনে পোড়া জগলুর ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া যায় বাঁশঝাড়ের কাছে। পুত্র হন্তার অন্তিম পরিণতিতে হাফেজ মিয়াঁর মনে প্রশান্তি আসে। সে আজ চোখের সামনে দেখে গল্প শোনা 'যোদ্ধা বাবলুকে'। গল্পটিতে সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে উচ্চ ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি, শোষক ও শোষিতের রূপ প্রকট হয়েছে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের জাতীয় পটভূমির পরিবর্তিত পরিস্থিতি, মুক্তিযোদ্ধাদের বিলুপ্তি ও জীবিতদের বিবর্ণ পরিণাম, হানাদার বাহিনির সহযোগীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতার দম্ভ ও মুক্তিযোদ্ধার বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্বের সাহসী যোদ্ধাসুলভ পুনরুত্থান এই গল্পে বলিষ্ঠ ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। রশীদ হায়দারের 'এ কোন ঠিকানা' গল্পে রাজাকার নান্টু ও মুক্তিযোদ্ধা মাজেদের ছোটভাই বাসেতের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনি গতি বিস্তার করে। সময়ের বহতা স্রোতের টানে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন মাজেদ। যুদ্ধ সমাপনীর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নান্টু পুরনো 'বন্ধু'র পুরোনো বাড়ির ঠিকানা চাইছিলেন বাসেতের কাছে। বাড়ির পথের বিবরণের সঙ্গে এগিয়ে চলে গল্পের তির্যক ভঙ্গি ও বৃদ্ধি পায় নাটকীয়তা। প্রাক্তন রাজাকার নান্টু কোন 'আদর্শে' বলীয়ান হয়ে 'দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার' শাস্তিস্বরূপ বন্ধুকে হত্যা করেছিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার যুক্তিও আছে। সেই পথে এগোতে এগোতে পাঠকের চেনা হয়ে যায় মিলিটারির হাতে খুন হওয়া লোকমান, 'নওশের'রা। ভাল করে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় এনামের মায়ের কান্নার সুর। মিলিটারিরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তার মেয়েকে, সে আর ফিরে আসেনি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাজেদ গিয়ে আর ফিরে আসে না। সেই সময়ে সাহায্যের জন্য নান্টুর কাছে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। অগনিত লাশের গন্ধে ভারাক্রান্ত, নানা গলিঘুঁজি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পাওয়া যায় উদ্দিষ্ট গন্তব্য। এই গল্প পাঠককে সেই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে চায় যেখানে পৌঁছালে পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, স্বজন হারানো মানুষের কান্না, অগণিত আপনজনের লাশ আর রাজাকারদের মত দেশদ্রোহী মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প, তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের নোংরা কুযুক্তি। গল্পের উদ্দিষ্ট বাড়ি তো প্রকৃতপক্ষে সেইসব বাড়ি যেখান থেকে যুদ্ধে দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষ যোগদান করেছিল জান-প্রাণ কবুল করে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অসংখ্য রাজাকারদের অনেকেই নানা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেও সমাজপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ছদ্ম সহানুভূতির কথা বলে নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছিল, এ গল্প সে ছবিও দেখায়। মুক্তিযুদ্ধের ভিন্নধর্মী ক্ষতের চেহারা দেখিয়েছেন গল্পকার মাহমুদুল হক তাঁর 'কালো মাফলার' গল্পে। এক রাতে বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতে সাংকেতিক চিঠি রাখতে আসে মুক্তিযোদ্ধা টুলটুল। পথে চোর সন্দেহে পাড়ার লোকজনের হাতে মার খেয়ে মারা গেছে টুলটুল, তার গলায় একটা কালো মাফলারের ফাঁস আটা। মুক্তিযোদ্ধার অবশিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে বড় ভাই মনোয়ার এগিয়ে যায়। টুলটুল দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মারা গেলেও মনোয়ারের মত অসংখ্য মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত করে গিয়েছিল।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চের নয় মাস পরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের বিপক্ষে প্রথম পাকিস্তানি বিমান আক্রমণের পর পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, দেশের বিমান বাহিনি, নৌবাহিনি ও সেনাবাহিনির প্রধানকে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নানা পরিকল্পনা, প্রস্তুতি নিয়ে ভারত সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রতিরোধ প্রতিহত করতে পাক বাহিনি ঘাঁটি দখলের চেষ্টায় বিফল হয়। মিত্রবাহিনি ক্রমশ তাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার রাস্তায় হাঁটে। জেনারেল নিয়াজী এমত অবস্থায় পাক বাহিনিকে নির্দেশ দেন-'পুলব্যাক'। জেনারেল নিয়াজীর 'পুলব্যাক' নির্দেশের পর তাই গোটা বাংলাদেশের পাকবাহিনিতে একটি সত্যিকারের অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হলো। অধিকাংশ পাকসীমান্ত ঘাঁটির সামনেই তখন একই সমস্যা। সীমান্তঘাঁটিতে বসে থাকার

চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য। আবার পিছুতে গেলেও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতিতে লেখা হাসান আজিজুল হকের লেখা গল্প 'আটক'। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে ভারতীয় মিত্রবাহিনি ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনির আক্রমণে পাকিস্তানি হানাদারদের পর্যুদস্ত অবস্থা দেখান হয়েছে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে কোণঠাসা পাকিস্তানি সেনাবাহিনির করুণ অবস্থায় স্বাধীনচেতা পূর্ব বাংলার মানুষের উৎফুল্লতার বিবরণ। মিত্র বাহিনির বোমা পড়ে পাটের গুদামে লুকিয়ে থাকা সেনার ছিন্নভিন্ন শরীর দেখেও মানুষের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। অন্যদিকে বোমার আঘাতে চিড় খাওয়া দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়ে যায় জোয়ান ছেলে, তার চিৎকারে শেষ রক্ষা হয় না। বুট পরা পায়ের নিচে যেমন কুড়মুড় শব্দে মরা শামুকের খোলা গুঁড়িয়ে যায় তেমনি করে গুঁড়িয়ে গেল দেওয়ালের নিচে চাপা পড়া মানুষের শরীর। দেশের জনগণ পাকিস্তানি সৈন্যের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল, আকুতি করেছিল কিন্তু বাঁচতে পারেনি। দেওয়াল চাপা পড়া লোকটিও মারা যায়। এই গল্পকারের 'মাটির তলায় মাটি' গল্পে যুদ্ধের সময়কালীন অস্থির পরিস্থিতি স্থান পেয়েছে। মিত্রবাহিনির যুদ্ধবিমানের আক্রমণে পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনি দিশাহারা হয়ে পড়ে। শহরের লোকজন নিজেদের নিরাপদ রাখতে অন্যত্র আশ্রয় নিতে চান। মানুষজন চলে যেতে চান গ্রামের দিকে। গল্পকথক শহর থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গিয়ে ওঠেন এক কৃষকের বাড়িতে। কথায় কথায় জানতে পারেন, এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছে সেই কৃষকের ছেলেও। একদিকে মাটির তলায় শুয়ে আছে ছেলে, অন্যদিকে মাটিতে ফসল ফলিয়ে অসংখ্য নিরন্ন ও অসহায় মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দেন শহীদের দেশপ্রেমী বাবা। নীরবে দেশের সেবা করে যাওয়া মানুষের প্রতিনিধি শহীদের পিতা। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দলীয় রাজনীতির আবর্তে দেশের অভ্যন্তরে যে কাঙ্ক্ষিত শান্তি, নিরাপত্তা আসেনি এবং দেশের মানুষকে যে প্রকৃত 'স্বাধীনতা' দিতে পারেনি তা ইমদাদুল হক মিলনের 'লাশ পড়ছে' গল্পে স্পষ্ট হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে পাক হানাদার ও দেশীয় রাজাকাররা ছিল বিরূদ্ধপক্ষ। বর্তমান বাংলাদেশের বিরূদ্ধপক্ষ হল সরকারি দল ও পুলিশ প্রশাসন। তাদের প্রতি ঘৃণা উগরে দেয় তরুণ পার্টিকর্মী সারোয়ার। অন্য এক কর্মী-বন্ধুর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়, যে সব রাজাকারদের ক্ষমা করা হয়েছিল, তারা এখন দেশের বর্তমান ক্ষমতার শীর্ষে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষিত তরুণ যেমন নকশালবাড়ি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেমনি মুক্তিযুদ্ধেও সেই ছাত্রদল অংশগ্রহণ করেছিল। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট পৃথক হলেও তাদের আত্মিক নিবেদনটুকু ম্লান হয় না। মুক্তিযুদ্ধের লড়াই শেষ হলেও তরুণদের সমাজ বদলের স্বপ্ন জাগরুক থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যাদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল সেই মুক্তিযোদ্ধাদের চরম অবহেলা আর অযত্নের মর্মন্তুদ কাহিনি ফুটে উঠেছে হাসান আজিজুল হকের 'কেউ আসেনি' গল্পে। হাসপাতালে অযত্ন আর অবহেলায় মৃত বন্ধুর পরিণাম দেখে এক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধার মনে প্রশ্ন জাগে- যুদ্ধ করে কী পেলেন তাঁরা! হাসান আজিজুল হকের 'ফেরা' গল্পে অর্জিত স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের শেষে সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে থাকা অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করে। যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরে আসা এক মুক্তিযোদ্ধা আলেফ সেই নির্দেশ পালন না করে বাড়ির সামনে থাকা ডোবার মধ্যে অস্ত্র লুকিয়ে রাখে। আলেফের মনে হয় পরে হয়ত আবার অস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে। এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস ও ভরসা করতে পারে না। তার মনে হয় যে নিশ্চিত জীবনের স্বপ্ন তারা দেখেছিল, তাতে কোথাও প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে। হতদরিদ্র এক মানুষের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পা গুলিবিদ্ধ হয়ে ফিরে আসা এই পর্যন্ত গল্প একরৈখিক। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে নানামাত্রিক হতাশা, যন্ত্রণায় পূর্ণ নেতিবাচক বর্তমানে পৌঁছানো বাস্তব জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি সে। তাই নতুন সরকারের স্পষ্ট নির্দেশিকার পরেও আলেফ রাইফেল ডোবায় ফেলে রাখে। আপাতদৃষ্টিতে গল্প শেষ হয় কিন্তু পুনরায় বিপ্লবের আর এক আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায় যোদ্ধার অন্তরে। এতদিন সে যুদ্ধ করেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য, এখন সে যুদ্ধ করবে পেটের জন্য। আরও বৃহত্তর এক সংগ্রাম ক্ষেত্র তার জন্য অপেক্ষারত। যুদ্ধের বিশালতার মধ্যে আত্মগোপনকারী নানাবিধ চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নির্মোহ প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে সেলিনা হোসেনের 'পরজন্ম' গল্পটিতে। আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ কাজেম আলীর স্ত্রী ও দুই পুত্র মারা যায় কলেরায়। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয় চার পুত্র।

ধোপাডাঙা চৌকি দখল করতে গিয়ে ধরা পড়া মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয় বাবা-মায়ের চোখের সামনে, ছোট দুই ভাইয়ের চোখের সামনেই। জীবনের নিয়মে বেঁচে থাকেন কাজেম। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন-

"হামার ভিটাত পরের জায়গা ন্যাই।" [৯]

এই স্পষ্টবাক মানুষটি অবশেষে বিয়ে করেন এক বিধবা তরুণীকে। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা-

"হামার ভিটাত পাঁচ পুরুষের পত্তন চ্যাই।"[১০]

ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার এই স্বচ্ছতা আসলে নিজের উত্তর পুরুষে নিজের অস্তিত্ব অন্বেষণ। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেও শহীদ পুত্রদের রক্তেভেজা এই ভিটের মর্যাদা যেন ভবিষ্যতে অক্ষুন্ন থাকে, এই আকুতি গল্পের ভেতরে আত্মগোপনকারী যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে। 'পরজন্ম' একটা আশার আলো যেখানে মানুষ অপ্রাপ্তি আর প্রত্যাশাগুলোকে বহন করে। গল্পের সমাপনী তাই নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক জীবনবোধের ইঙ্গিত দেয়। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'ঘরে ফেরা' গল্পে সব হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ যখন ঘরে ফেরে তখন সেই প্রত্যাবর্তন প্রকৃত ফেরা হয় কিনা সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন পাঠক। 'ঘর' তো শুধু ইঁট, কাঠ পাথরের জড় পদার্থের নয়, কাছের মানুষের বিহনে সেই চার দেওয়ালের মধ্যে ফেরা বড় অসহনীয়। চারদিকে শুধু মৃত্যুর হাহাকার, শোকের আবহে কেবল শারীরিকভাবে ফিরতে পারার বাস্তবতা মানুষকে শান্তি, নিরাপত্তা আর ভালোবাসা দিতে পারে না।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের নানা বিদ্রোহ ও আন্দোলনের উল্লেখ, বিপরীত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের নানা কর্মকাণ্ড এবং 'পরগাছা' রাজাকার-আলবদর-আলশামস শান্তিবাহিনির নৃশংসতা নিয়ে লেখা রাবেয়া খাতুনের 'যে ভুলে যায়' গল্প কোন নিটোল আখ্যান নয়। এ যেন বাংলাদেশ জন্মের পূর্ব ইতিহাস থেকে নয় মাসের গর্ভাবস্থা অতিবাহিত করে রাষ্ট্র-জন্মের ঘটনার ধারাবিবরণী। বিদ্রোহ, আন্দোলনকে সামনে রেখে এই গল্প সাল-তারিখ চিহ্নিত ইতিহাসের এক জ্বলন্ত দলিল। মধ্যবিত্ত সমাজ মনস্তত্ত্বকে গল্পে পাওয়া গেছে অন্তরঙ্গরূপে। অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল তার সম্মান ও তাৎপর্য কতখানি সে বিষয়ে এক গভীর প্রশ্ন তুলেছেন গল্পকার। হুমায়ূন আহমেদের 'শ্যামল ছায়া' গল্পে সরাসরি যুদ্ধের কথার পরিবর্তে একজন মুক্তিযোদ্ধার অন্তরের কথা ফুটে উঠেছে মরমী লেখনীতে। বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে নিয়ে মজিদ যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে পা হারানো মজিদ, প্রেয়সীকে অন্যের স্ত্রী হিসেবে দেখে। যুদ্ধ পূর্ববর্তী থমথমে আতঙ্কময় পরিবেশ, ইলেকশনের অনিশ্চয়তা, মুজিবুর রহমানের নির্দেশের প্রসঙ্গের মধ্যে অনুভব করা যায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। আবার যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছবি পাওয়া যায় মজিদের ভাঙাচোরা শরীর ও মনের মধ্য দিয়ে। দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য বিপ্লবীদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের মানসিক চাপ ও উদ্বেলতার কথাও অনুভব করা যায় তার মা-বাবার ভাবনার মধ্য দিয়ে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ যোগদান করেছিলেন বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ঐক্যকে অখন্ড করার প্রচেষ্টায়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনি দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তা পেয়েছিল বলেই এই যুদ্ধে নৃশংসতা ও শোষণ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। অসংখ্য বাঙালি সরকারি চাকরি করতেন। ফলে বাধ্য হতেন প্রশাসনের নির্দেশ মত চলতে, তবে তাঁদের অন্তরে বহ্নিমাণ ছিল দেশপ্রেম। তাঁদের মনে সদাজাগ্রত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। তাঁরা গোপনে, পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। এমনই একজন যোদ্ধা আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার'। পেশায় সরকারি লোক হলেও তাঁর মতো নীরব অনুঘটকের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। যে কোন বিদ্রোহ ও আন্দোলনে প্রশাসনে থেকে, সরকারি পদাধিকারী হয়ে সাহায্য করার চিত্র বহু পুরনো। এ কাজে যুক্ত সকলের নামধাম আজও জানা নেই। তাদের মধ্যে অসংখ্য 'কলিমদ্দি দফাদার' ছিলেন এ কথা বলা বাহুল্য। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যাওয়া এই রকম অসংখ্য মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শওকত ওসমানের 'দুই

ব্রিগেডিয়ার' নামক অনবদ্য ছোটোগল্পের ব্রিগেডিয়ার চরিত্রটি। এছাড়া মঈনুল আহসান সাবেরের 'কবেজ লেঠেল' গল্পের আখ্যানে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গ্রামে আর্মির আগমনপূর্ব উত্তেজনা ও আশঙ্কা এবং আর্মি আগমনের পরের ভয়াবহ পরিবেশের কথা আছে। দুই জোতদারের একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টায় সরকার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার পৈশাচিক প্রতিযোগিতার বর্ণনা পড়লে অসুস্থ বোধ করে সুস্থ মানুষও। গল্পের এহেন গতির পাশে কবেজের নির্লিপ্তি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় পাঠক ক্রমশ তার মনোজগত অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে। গল্পের নাম কবেজ লেঠেল হলেও আমরা তাকে ভাড়াটে খুনি হিসেবেই পাই, তাকে লাঠিয়াল বলা চলে না। যার বিনা সঙ্কোচে লোক খুন করতে হাত কাঁপেনি, সে কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াকু সৈনিকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। সে অর্থের বিনিময়ে নয়, নিজের বিবেকের তাড়নায় হত্যা করেছে রমজান শেখকে। সে যখন আর্থিক প্রলোভনকে জয় করে অত্যাচারের পাশবিকতাকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে তখন পরের শিকার অন্য কোন জোতদারও হতে পারে, এই ইঙ্গিত রেখেই গল্প শেষ হয়েছে। হাসান আজিজুল হকের 'কৃষ্ণপক্ষের একদিন' গল্পে জামাল, শহীদ, একরাম, মতিয়ূর ও রহমান- এই পাঁচজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার রূদ্ধশ্বাস অভিযানের ঘটনা দিয়ে কাহিনি শুরু। ক্রমশ তাদের অবর্ণনীয় বিভীষিকাময় অবস্থা ও সমাজের সর্বস্তরে থেকে কীভাবে প্রতিরোধের ছবি উঠে এসেছিল তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাঁচজন গেরিলাযোদ্ধার পেশার বৈচিত্রে। গল্পে প্রতিটি যোদ্ধার মানসিক গতি প্রকৃতি ও দ্বন্দ্বের ছবিও বিদ্যমান। জীবনের থেকে বিপ্লবকে মূল্যবান মনে করেই তারা আত্ম বলিদানের পথে এগিয়ে এসেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকালীন আবহে দেশের নারীদের ওপর অকথ্য পাশবিকতা চালিয়ে যাওয়া মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতর আবেগকে পুঁজি করে যুদ্ধের উত্তাল দিনে এ দেশের নারীরা পিছিয়ে থাকেননি। খারাপ লাগলেও অস্বীকার করা যায় না যে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নারীর ভূমিকার কথা এক অর্থে অজ্ঞাত ছিল। যুদ্ধের সময়ে ধর্ষিতা, স্বামীহারা নারীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি মুখ্য ছিল। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত নির্যাতিত নারীদের পারিবারিকভাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করার যে সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের ছিল না। একাত্তরের নিগৃহীত নারীকে বোঝার ও জানার জন্য দৃষ্টির যে সুগভীর আন্তরিকতা প্রয়োজন তা অনেক সময় দেখা যায়নি। একাত্তরের নারীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সাধারণত তাদের শোকার্ত হিসেবে দেখান হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ যেন কেবল সেনাদের ব্যাপার, বন্দুক হাতে না নিলে মুক্তিযুদ্ধ হয় না এইরকম একটি ভাবনা পোষণ করা হয়েছিল। নারীরা যে সমাজ কাঠামো, পারিবারিক ও লিঙ্গীয় সামাজিকীকরণের ফলে গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর সংগ্রাম বিকাশ লাভ করেছে। কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে একাত্তরের নারীকে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও এই নারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে ব্যতিক্রমী হিসেবে। কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি নির্যাতিত নারীদের 'যুদ্ধাহত' পরিচয় তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগেই বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিরা যখন ভারতে গিয়ে পরিকল্পিত মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানায় তখন কিন্তু সরকার কাঠামোতে কোন নারী সাংসদ, নারী নেত্রীকে যুক্ত করা হয়নি। তার পরেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে নারীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য তৈরি করা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নারী সাংসদদের দায়িত্ব দেওয়া এজাতীয় কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় তৎকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দল থেকে কেবল নারীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ও বিএসএফ ক্যাম্পে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে বিভিন্ন ক্যাম্পে কিন্তু মেয়েরা অস্ত্র চালনা শিখেছিলেন। যুদ্ধ করতে যাবেন মেয়েরা সেটা অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও নারীরা খবর আদান প্রদান করতেন, শিশুরা কাজ করেছে অ্যান্টেনার মতো, তাদের কাজ ছিল যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। দেশ স্বাধীন হয়েছে শুধু পুরুষদের জন্য নয়, নারীরাও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন একথা স্বীকার করেন না সকলে। বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখা, তাদের অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া বা যারা মা-

বোনদের, স্ত্রীদের ফেলে রেখে মুক্তিযুদ্ধে গেছেন তাঁদের সবকিছু সামলে গোপন করে রাখা এসব নারীরা করেছেন। তার পরিবর্তে তাদের ধর্ষিত হতে হয়েছে, খুন হতে হয়েছে, তাদের গর্ভপাত হয়েছে এবং অনেক সময় গর্ভধারণ করে যুদ্ধশিশুর জন্ম দিতে বাধ্য হতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে মেয়েদের বিভিন্ন ভাবনা সাহস কর্মকাণ্ড নানা তথ্য ছড়িয়ে আছে নানাজনের লেখায়। সেইসব ইতিহাস থেকে নারীর সাহসিকতা ও নির্যাতনের ছবি গল্পে কীভাবে উঠে এসেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। সত্যেন সেনের 'পরীবানুর কাহিনী' গল্পে বাঙালি রাষ্ট্র গঠনে বাঙালি নারীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা চিত্রায়িত হয়েছে। কলকাতায় আশ্রিত তথাকথিত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে একটি আপাতত তুলনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হাসনাত আবদুল হাই রচিত 'একাত্তরে মোপাসাঁ' গল্পেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির নারী লোলুপতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে গভীর মনোনিবেশে। আবু রুশদের 'খালাস' গল্পের মূল চরিত্র শাহানা নিজের শরীরের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। শামসুল হকের 'কথোপকথন : তরুণ দম্পতির' গল্পে বাংলাদেশের মুজিবনগর মুজিবের গ্রেফতারির প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে আগরতলার ম্যাপ-এর কথা যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং নিতে আসত। **১৯৭১** এর **২৫** মার্চ অপারেশন সার্চলাইট হবার পর বাঙালি মুসলমান দাড়ি-টুপির আড়ালে পাকিস্তানি সেনার হাত থেকে বাঁচার পথ খুঁজেছে। তারপরে গল্প যত এগিয়েছে আমরা বুঝতে পারি সেই নিদারুণ মূহূর্ত এসে উপস্থিত যেখানে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করার বীভৎস নির্যাতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের এক গ্রামের তিন মাইল দূরে মিলিটারি ক্যাম্প করার কথা শুনে গ্রামেরই এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের নারীদের উদ্বেগ ও পরিণতি জাহানারা ইমামের 'উপলব্ধি' গল্পে স্থান পেয়েছে। সেনা ও রাজাকাররা এসে বাড়ির কর্তা ও পুত্রকে তালতলীতে বাঙ্কার বানানোর কাজে বেকার খাটতে নিয়ে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় যুবতী পুত্রবধূকে। কয়েকদিন পরে লাকী ফিরে এলেও শাশুড়ি তাকে গ্রহণ করতে পারে না। তার কাছে পুত্রবধূর ইজ্জত যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ছিল। প্রবল অপমানে আত্মহত্যা করে লাকী। শোকের আগুন প্রশমিত হলে পুত্র রসুল মুক্তিযুদ্ধে যেতে চায়। মা তাকে নির্দেশ দেন দুই বোনকে মুক্তিযোদ্ধার জন্য নির্মিত হাসপাতালে নার্সের কাজ করতে নিয়ে যেতে। তিনি এক কন্যাকে মিলিটারিদের জন্য হারিয়ে ফেললেন, আরও দুই কন্যাকে উৎসর্গ করলেন মুক্তিযুদ্ধের কাজে। জীবনকে হারিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন জীবনের বৃহত্তর মূল্যের। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নারীর সামাজিক মর্যাদা যে কতখানি ঠুনকো এই উপলব্ধি পাঠকের সঙ্গে আসিফারও। জীবন প্রবাহে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এমন কিছু বিশেষ ঘটনা মনকে নাড়া দিয়ে যায় যা জীবনকে অনুভব করার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা ছোটোগল্প 'উপলব্ধি' সেই পরিবরতিত দৃষ্টিভঙ্গির গল্প।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ছোটোগল্পের অপ্রতুলতার কারণ হিসেবে বলা যায়,সমকালে নকশাল আন্দোলন ও জরুরি অবস্থার সাঁড়াশি আক্রমণে দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থান প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নকশাল নেতৃত্বের সঙ্গে কংগ্রেসের আচরণ এবং জরুরি অবস্থাকালীন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আচরণে মানুষ আগ্রহী ছিলেন না। বিরূপতা সত্ত্বেও ছিন্নমূল মানুষের দেশত্যাগের মর্মন্তুদ ছবি পশ্চিমবঙ্গের গল্পে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'স্বদেশে সংসারে', প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ', গুণময় মান্নার 'দূরবর্তী', অসীম রায়ের 'করিমের জাগরণ', স্বর্ণ মিত্রের 'উত্তরকাল' গল্প। প্রতিটি গল্পে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী পরিবারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, অজয়, খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.), বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২, পৃ. ১৮৬

২. হাসনাত, আবুল (সম্পা.), liberationwarbangladesh.org, মুক্তিযুদ্ধের গল্প (pdf), সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২, পৃ. ৪৩

৩. ঐ, পৃ. ৪৬
৪. ঐ, পৃ. ৫৫
৫. ঐ, পৃ. ৫৪
৬. ঐ, পৃ. ২৬৫
৭. ঐ, পৃ. ২৫৯
৮. ঐ, পৃ. ২৬৫
৯. ঐ, পৃ. ৯৬
১০. ঐ, পৃ. ১০৪